



A Peer-Reviewed Article
ISSN: 3136-9049
eISSN: 3136-9057

North Bengal International
University Journal
<https://journal.nbiu.edu.bd>

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা : পরিপ্রেক্ষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম

The Local Government System of Bangladesh: The Context of the Chittagong Hill Tracts

Dolon Chakrabarty*

Abstract

The local government system of Bangladesh plays a crucial role in ensuring grassroots participation, decentralization of power, and effective service delivery. However, the Chittagong Hill Tracts (CHT) at present a unique administrative and governance context due to their distinct ethnic composition, historical background, and special constitutional and legal arrangements. This paper examines the structure and functioning of the local government system in Bangladesh with a particular focus on the Chittagong Hill Tracts. It analyzes how traditional institutions, such as the Circle Chiefs and Headmen, interact with formal local government bodies, including the Hill District Councils and Regional Council. The study also explores the impact of the Chittagong Hill Tracts Peace Accord of 1997 on local governance, autonomy, and development. By highlighting the challenges and opportunities of local governance in the CHT, the paper aims to contribute to a deeper understanding of decentralized governance in pluralistic societies like Bangladesh.

Keywords: Local Government, Local Self Government, Chittagong Hill Tracts, Peace Accord, Draft Bill, Bangladesh.

ভূমিকা

রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে সমস্যা সমাধানের জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে উঠে। বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জনগণ রাষ্ট্রের শাসনকার্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। তাই স্থানীয় শাসন গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ। তবে বাংলাদেশের সামগ্রিক স্থানীয় সরকার কাঠামোর মধ্যে পার্বত্য

*Assistant Professor, Department of Political Science, North Bengal International University, Rajshahi, Bangladesh.

চট্টগ্রাম একটি বিশেষ ও ব্যতিক্রমী অঞ্চল। এর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, নৃগোষ্ঠীগত বৈচিত্র্য, ঐতিহাসিক পটভূমি এবং বিশেষ আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে একটি স্বতন্ত্র রূপ প্রদান করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেমন- সার্কেল চিফ, হেডম্যান ও কারবারি-আধুনিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির মাধ্যমে এ অঞ্চলের স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ হয়, যার ফলে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের মতো প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠান স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার কথা থাকলেও বাস্তব ক্ষেত্রে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এই প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কাঠামো, কার্যকারিতা ও চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করা বাংলাদেশের স্থানীয় শাসনব্যবস্থা বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গবেষণার উদ্দেশ্য

১. বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সামগ্রিক কাঠামো ও কার্যাবলী পর্যালোচনা করা।
২. চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের স্থানীয় শাসনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও প্রশাসনিক বিবর্তন বিশ্লেষণ করা।
৩. স্থানীয় শাসন ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের উপর ১৯৯৭ সালের চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল শান্তি চুক্তির বাস্তবায়ন ও প্রভাব মূল্যায়ন করা।
৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মুখীন হওয়া প্রধান প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করা।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি তুলনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির উপাদানসহ একটি গুণগত ও বর্ণনামূলক গবেষণা নকশা অনুসরণ করে। এর উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের (সিএইচটি) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গঠন, কার্যাবলী, প্রতিবন্ধকতা এবং কার্যকারিতা পরীক্ষা করা। গবেষণাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনন্য প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, জাতিগত এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট অনুধাবনের উপর জোর দেয়।

স্থানীয় সরকার

স্থানীয় সরকার হচ্ছে সমগ্র রাষ্ট্রকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে ক্ষুদ্রতর পরিসরে কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকারের অধীনে অর্পিত দায়িত্ব পালন করা। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এককভাবে রাষ্ট্রের যাবতীয় দায়িত্ব পালন সম্ভব নয় বিধায় কাজের চাপ লাঘব করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় সরকারকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করে থাকে। অর্থাৎ, যে সরকার ক্ষুদ্র এলাকায় থাকে এবং কিছু অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাকে স্থানীয় সরকার বলা হয়।^১ যেহেতু, কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রের যাবতীয় দায়দায়িত্ব পালনে অক্ষম, সেহেতু

স্থানীয় সরকারের হাতে কিছু ক্ষমতা অর্পিত থাকে।^২ স্থানীয় সরকার অর্পিত দায়িত্ব পালন করে মাত্র। বাংলাদেশের ইউনিয়ন, থানা, জেলা, বিভাগ প্রভৃতি স্থানীয় সরকারের উদাহরণ।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার

সাধারণত স্থানীয় সরকারগুলো যখন কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা না হয়ে এলাকার জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত ও স্থানীয় প্রতিনিধিবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত হয় তখন তাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার বলা হয়। স্থানীয় সরকার পরিচালিত হয় সরকারি কর্মচারীবৃন্দ কর্তৃক কিন্তু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার পরিচালিত হয় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা। ইন্ডিয়ান স্টেটুটরি কমিশনের ভাষ্য অনুসারে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের অর্থ— “একটি স্থানীয় প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন, যা স্থানীয় নির্বাচকদের নিকট দায়ী, যে ব্যবস্থা পরিচালনায় আইন, শাসন, এমনকি নিজস্ব তহবিল সৃষ্টির মানসে এলাকার জনসাধারণের উপর করারোপ করতে পারে এবং দায়িত্ব পালন ও সরকারের সামঞ্জস্য বিধানে একটি প্রশিক্ষণাগার হিসেবে কাজ করে।”^৩ আমাদের দেশে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের উদাহরণ।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের গুরুত্ব

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত মজবুত, সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হওয়ার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়। এছাড়াও এর মাধ্যমে সর্বস্তরে নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। হিউমস বলেন, “স্থানীয় নাগরিকবৃন্দ স্থানীয় সরকারের কার্যক্রমে সহজে অংশ নিতে এবং তার উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে, যা তারা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর পারে না।”^৪

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নেতৃত্ব সৃষ্টির সূতিকাগার। বলা বাহুল্য যে, অতীতে সর্বস্তরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সৃষ্টি না করার কারণে আজ আমাদের দেশে সকল স্তরে অভিজ্ঞ, যোগ্য ও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন নেতৃত্বের ব্যাপক শূন্যতা বিরাজ করছে। দুর্ভাগ্যবশত জাতিকে আজ এর মাশুল গুণতে হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ইতিহাস

অঞ্চলভেদে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলাদা হয়ে থাকে, কেননা স্থানীয় বিচিত্রতার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে স্থানীয় সমস্যার সমাধান করাই হলো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মূল উদ্দেশ্য।^৫ এজন্য গঠন পদ্ধতি ও কার্যাবলির পার্থক্য হওয়াই স্বাভাবিক। দেশের অন্য অঞ্চলের থেকে পার্বত্য জেলাগুলোর স্থানীয় পরিষদের স্বতন্ত্রতাব বর্তমান। ১৯৮১ সালের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি জেলা ছিল। এরশাদ সরকারের সময় মহকুমাগুলোকে জেলায় পরিণত করায় তিনটি মহকুমা যথা, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় পরিণত হয়। জেলা পর্যায়ে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের স্তর হল জেলা পরিষদ। মোট ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬১টিতে জেলা পরিষদ গঠন করা হয়। প্রথমত

পার্বত্য তিন জেলার জন্য কোনো স্বায়ত্তশাসিত সরকার ছিল না। তবে অন্য জেলায় অনুরূপ যথানিয়মে ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ গঠন করা হয়। পার্বত্যাঞ্চলের বিরাজিত সমস্যার সমাধানকল্পে ১৯৮৯ সালে জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার পরিষদ নামে স্বায়ত্তশাসিত সরকার চালু করা হয়। অন্য জেলা পরিষদ থেকে স্থানীয় সরকার পরিষদের গঠন প্রণালী ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে বিস্তার পার্থক্য আছে। আমার মুখ্য আলোচ্য বিষয় হল বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আলোচনা করা। তবে আলোচনার পূর্বে সহজ বোধগম্যতার কারণে এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও মূল সমস্যা কিঞ্চিৎ জানা দরকার। তাছাড়া ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের ‘শান্তিচুক্তি’র পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয়েছে পার্বত্য অঞ্চলের জন্য ‘আঞ্চলিক পরিষদ’ এবং পরিবর্তন সাধিত হয়েছে স্থানীয় সরকারের গঠন ও ক্ষমতায়। সুতরাং সংক্ষেপে বিষয়টি উত্থাপনের চেষ্টা করছি।

আয়তন ও অবস্থান

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের কয়েকটি প্রদেশ ও বার্মার সীমান্তের সাথে ভৌগোলিকভাবে যুক্ত। পূর্বে ভারতের মিজোরাম রাজ্য (সাবেক লুসাই পাহাড়), দক্ষিণে মায়ানমারের (বার্মার) আরাকান রাজ্য, উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং পশ্চিমে ভারতের ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলা অবস্থিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান আয়তন ৫,০৯৩ বর্গমাইল বা ১৩,২৫২ বর্গকিলোমিটার।

জনসংখ্যা

চট্টগ্রাম হিল ট্রাস্টস এর জনসংখ্যা বিভিন্ন উৎসে ভিন্নভাবে বলা হয়েছে; যেমন একটি উৎসে বলা হয়েছে “আনুমানিক ১.৮৪ মিলিয়ন জনগণ”। চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, খাসিয়া ও অন্যান্য ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। এই ভিন্নতর জনগোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে এক বিশেষ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়। ধর্মীয়ভাবে বৌদ্ধ ধর্ম এখানে বিশেষভাবে জনপ্রিয়।

প্রশাসনিক ইতিহাস

১৬৬৬ সালে মুঘলরা এই অঞ্চল দখল করে নেয় এবং বাংলার সাথে সংযুক্ত করে। ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত জেলা সদর ছিল চন্দ্রঘোনা এবং ১৮৬৯ সালে সদর স্থানান্তরিত হয় রাঙ্গামাটিতে। জেলায় তিনটি মহকুমা ছিল যথা- সদর, সাংগু এবং কক্সবাজার। ১৮৬০ সালের ১ মে সদর, ১৮৬১ সালের ১৪ মার্চ সাংগু এবং ১৮৬১ সালের ১১ অক্টোবর কক্সবাজার মহকুমা সৃষ্টি হয়। ১৮৬০ সালের ২৬ জুন ব্রিটিশ সরকার ২২নং প্রশাসনিক আদেশবলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসৃষ্টি করে। প্রথমে জেলার শাসনকর্তাকে বলা হত সুপারিনটেনডেন্ট। ১৮৬৭ সালে তাকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বলা হত।

১৯৪৪-৪৫ সালে ভারত ভাগ অনিবার্য হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের সাথে থাকর জন্য একান্ত আগ্রহী হয়। এজন্য চাকমা নেতা স্নেহকুমার চাকমা, কামিনী মোহন দেওয়ান ও রাজা ভুবন মোহন রায় কলকাতা, মাদ্রাজ ও দিল্লিতে ভারতীয় কংগ্রেস নেতাদের সাথে যোগাযোগ আরম্ভ

করেন। বোম্বে অবস্থানরত গান্ধীর সাথে নানা কথা বলার জন্য কাহিনী মোহন দেওয়ান সেখানে গমন করেন। তারা সরোজিনী নাইডু, সি.আর. দাস, আচার্য কৃপালনী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সরদার বল্লবভাই প্যাটেল ও হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর কাছে ব্যাপারটি তুলে ধরেন। সকল নেতার কাছে পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ পার্বত্য অঞ্চলকে ভারতের সাথে সংযুক্ত করার পরামর্শ দেন ও আত্মহ প্রকাশ করেন। অবশেষে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত করা হয়। মনের দুঃখে স্নেহকুমার চাকমা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে গমন করেন। একসময় তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। বান্দরবান রাজবংশের অনেকে বার্মায় চলে যান। কামিনী মোহন দেওয়ান পাকিস্তানেই থাকেন এবং ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের আইনসভায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন। ভারতের সাথে থাকতে না পারার দুঃখে ভাগ্য চাকমা আক্ষেপ করে বলেছিলেন, “জওহরলাল নেহেরু তাদের কথামতো ভারতের সাথে নিলে চাকমাদের এ অবস্থা হত না।”

পাকিস্তান সরকারের বৈরী নীতি

পাকিস্তান স্বাধীন হবার পর নানা জটিলতা হেতু ১৯৫৬ সালে সর্বপ্রথম সংবিধান প্রণীত হয়। উক্ত সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'বহির্ভূত' এলাকা হিসেবেই চিহ্নিত করা হয় এবং ১৯০০ সালের শাসনবিধি বলবৎ থাকে। করাচি থেকে প্রশাসন চালানো হত। ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারি হলে পার্বত্য অঞ্চলে দেশের নাগরিকদের জন্য চলাচলের পথ খুলে দেয়া হয়। পাকিস্তান আমলে ১৯৫৩ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে ১৯৫৭ সালে কাজ আরম্ভ এবং ১৯৬৩ সালে শেষ হয়। অত্যন্ত খরশ্রোতা এক গভীর অববাহিকায় প্রবাহিত নদী জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য উপযোগী মনে করা হয়। বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ আরম্ভ হলে সৃষ্ট কৃত্রিম হ্রদের আয়তন দাঁড়ায় ৪০০ বর্গ কি. মি. বা ২৫৪ বর্গমাইল। হ্রদ নির্মাণ হেতু ৫৪ হাজার একর জমি প্লাবিত হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন

১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সময়ই নির্ধারিত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তান হয় এবার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা লাভ করবে না হয় স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। সমগ্র বাঙালি আওয়ামী লীগের পতাকাতে সমবেত হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টির মধ্যে ২৯৮টি এবং জাতীয় পরিষদের ৩১৩টির মধ্যে ১৬৭টি আসনে বিজয়ী হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের ভিত শক্ত ছিল না। রাজা ত্রিদিব রায়কে আওয়ামী লীগ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানালে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। রাজা ত্রিদিব রায় নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হন। প্রাদেশিক পরিষদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও অংশু-এ-প্রফ চৌধুরী। আওয়ামী লীগের দুই জন সদস্য হলেন চারু বিকাশ চাকমা ও রাজা ত্রিদিব রায়ের চাচা কোকনাদক্ষ রায়। বিজয়ী সদস্যগণ স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। পাকিস্তান সরকারের একগুঁয়েমি মনোভাবের কারণে বিজিত দল আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে দেয়া হয়নি। অবশেষে বাঙালির জন্য মুক্তিযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

দেশ স্বাধীন হলে তারা ঐ অঞ্চলের জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবি করলে প্রধানমন্ত্রী একসময় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে ভীতিও প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি লারমাকে বলেন, “লারমা তুমি কী মনে কর? তোমরা যে রয়েছ ৫-৬ লক্ষ। বেশি বাড়াবাড়ি করো না। চুপ থাক। বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রের ব্যবহার হবে না, প্রয়োজনে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ১০ লক্ষ বাঙালি অনুপ্রবেশ করে তোমাদের উৎখাত করবে। বাঙালি হয়ে বাংলাদেশে বসবাস করতে হবে।”^৬ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা প্রধানমন্ত্রীর ভয়ে চুপ থাকেননি বরং তিনি সংসদে বসেই বলেছিলেন, “আমি একজন চাকমা, একজন চাকমা একজন মারমা হতে পারে না। তেমনি একজন চাকমা বাঙালি হতে পারে না। আমি একজন চাকমা, আমি বাঙালি নই। আমি বাংলাদেশের নাগরিক, বাংলাদেশী। আপনিও বাংলাদেশী। কিন্তু আপনার জাতীয় পরিচয় বাঙালি। তারা (উপজাতি) কোনো সময়ে বাঙালি হতে পারে না।” সেদিন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা উপজাতীয়দের অধিকার আদায়ের জন্য বিশেষ বক্তব্য পেশ করেন। তিনিও বিকল্প পথের সন্ধানে ১৯৭২ সালের ২৪ জুন গঠন করেন জনসংহতি সমিতি। ১৯৭২ সালের ১৬ মে গঠিত হয় রাজ্যমার্টি কমিউনিস্ট পার্টি। পার্টির প্রধান নেতা ছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।

১৯৭২ সালে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র দুষ্টকারীদের মোকাবেলা করার জন্য পুলিশ মোতায়েন করে। ১৯৭৩ সালের ৩ আগস্ট বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা দেবার জন্য সামরিক বাহিনী পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়। ১৯৭৪ সালে নিরাপত্তা বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থান নেয়।^৭ ১৯৭৪ সালে খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালায় এবং বান্দরবানের আলীকদম ও রুমায় সেনানিবাসের গোড়াপত্তন হয়। সেই সময় তিনি বলেছিলেন, “আমরা এখন সবাই বাঙালি। এখানে কোন উপজাতি নেই। আমি আজকে আপনাদের উপজাতি থেকে জাতিতে প্রমোশন দিলাম।” এ কথার নানা সমালোচনা করা যায়, কেননা তিনি প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে পারেননি। কিন্তু যে নেতা সারা জীবন বাঙালি আর বাংলাদেশের জন্য সংগ্রাম করলেন তিনি সবাইকে বাঙালিই ভাববেন এটা স্বাভাবিক। ঐ সভায় তিনি যে তাদের বাঙালি হতেই পরামর্শ দিয়েছিলেন তা নয়। তিনি ঘোষণা করেন যে, উপজাতিদের ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য সংস্কৃতি, সামাজিক জীবন ও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না।^৮ ১৯৭০ সালে তিনি আওয়ামী লীগ নেতা চারুবিকাশ চাকমার সাথে দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্তরিকভাবে আলাপ করেন। ১৯৭৩ সালে সংবিধানে সমগ্র বাংলাদেশে যে ১৫টি সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিল তার একটি তিনি তাদের প্রদান করেন। মূলতঃ পার্বত্যবাসীদের সমস্যা সমাধানের জন্যই শ্রীমতী সুদীপ্তাকে মহিলা সাংসদ হিসেবে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। যে এম.এন. লারমা তার চোখের সামনে থেকে দৃষ্টভরে সংসদ থেকে বেরিয়ে আসেন তাকেও তিনি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছেন। আন্তরিকতার জন্যই বঙ্গবন্ধু বিপথগামী চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়কে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ১৯৭২ সালে রাজমাতা বিনীতা রায়কে আমেরিকা প্রেরণ করেন। তখন রাজা আমেরিকায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু ত্রিদিব রায় দেশে প্রত্যাবর্তন করেননি। সাধারণ মানুষের মনে আস্থা স্থাপনের জন্য তিনি ত্রিদিব বায়ের ৮ বছর বয়সী ছেলে দেবশীষ রায়কে রাজপদে বসান। তিনি উপজাতীয় ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান, শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য আসন সংরক্ষণসহ নানাবিধ সুবিধা প্রদান

করেন।^৯ তিনি সংবিধানের মধ্য থেকেই তাদের সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। এম.এন. লারমা তাকে বশে আনতে না পেরে অবশেষে চাই থোয়াই রোয়াজসহ ১৯৭৫ সালে নবগঠিত বাকশালে যোগদান করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তার প্রতি আর আস্থা স্থাপন করতে পারেননি, সেজন্য বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটি, জেলা গভর্নর বা বাকশালের জেলা সেক্রেটারিতে লারমাকে রাখেননি।

জিয়াউর রহমান সরকারের পদক্ষেপ

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিব নিহত হবার পর খন্দকার মোস্তাক সেনাবাহিনীর সহায়তায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির গদিতে বসেন। তিনি পার্বত্যবাসীদের 'জনসংহতি সমিতি' নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এতে শান্তিবাহিনীর কার্যকলাপ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। এম.এন. লারমা বঙ্গবন্ধুর কাছে কোনো সুবিধা করতে না পেরে ভারতে গমন করেন এবং সেখান থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকেন। মুজিব সরকারের পতনের পর শান্তিবাহিনী ব্যাপক শক্তি সঞ্চয় করে। এর পিছনে ভারতের মদদ ছিল।^{১০} খন্দকার মোস্তাককে অপসারণ করে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করেন। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসেই ডিসেম্বর মাসে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের জন্য গঠন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। এটা ছিল প্রথম পদক্ষেপ। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময়কালের গৃহীত ব্যবস্থার মধ্যে বাঙালিদের বসতি দান একটি। পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালিদের বসতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ১৯৮০ সালের আগস্ট মাসের ২১ তারিখে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারের ৫-৯-৮০ এক চিঠিতে গ্রাম সরকার প্রধানদের জানিয়ে দেয়া হয় যে, বিশাল পতিত ভূমিতে বিনামূল্যে ভূমিহীনদের বসতি দেয়া হবে। যারা সেখানে যাবে তাদের বিনামূল্যে জমি ছাড়াও নানাবিধ সুবিধা দেয়া হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাপ্রশাসকের ১৯৮০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর মাসের এক সার্কুলারেও অনুরূপ বিষয় অবগত করানো হয়।^{১১} অবশ্য বসতি দানের পরিকল্পনা এবং কার্যক্রম আগেই আরম্ভ করা হয়। এক হিসাবে জানা যায়, ১৯৭৯ সালে প্রথম পর্যায়ে ২৮,৫১৫টি পরিবারকে বসতি দেয়া হয়। এসব পরিবারের মধ্যে ২,৯৫৩টি পরিবার পুনরায় সমভূমিতে ফিরে আসে দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৬,৭০৯টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয় এবং ৪,৭৬৯টি পরিবার প্রত্যাবর্তন করে। এরশাদ সরকারের সময়ও পুনর্বাসন কাজ চালু ছিল।

এরশাদ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হবার পর রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তারের স্বল্পকালীন সময়েও শান্তি স্থাপনের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। ১৯৮২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা জনাব সুবিমল দেওয়ান এক প্রতিনিধি দলসহ তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। রাষ্ট্রপতি সাত্তারের পর ক্ষমতায় আসীন হন জেনারেল এরশাদ। ক্ষমতা গ্রহণের পর ১৯৮২ সালের ২৯ জুলাই পার্বত্য সমস্যার সমাধানের জন্য খাগড়াছড়ি গমন এবং উপজাতীয় নেতাদের সাথে বৈঠক করেন। উক্ত আলোচনার সূত্র ধরে ১৯৮২ সালের ৪ আগস্ট রাজমাটিতে এক বৈঠক বসে। সে সময়ে উপজাতীয়দের পক্ষ থেকে সরকার সমীপে পেশের নিমিত্তে এক দাবিনামার খসড়া প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ হয়। এতে উপেন্দ্রলাল চাকমা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

১৯৮৬ সালের ১৭ নভেম্বর উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ জেনারেল এরশাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের কথা সবিস্তারে তুলে ধরেন। ১৯৮৭ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর এরশাদ পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরের সময় পাহাড়ি নেতাদের সাথে বৈঠক করেন। সেই সময়ই প্রথমবারের মতো তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের আহ্বান জানান। পরে তিন নেতা গৌতম দেওয়ানের বাসায় ১৯৮৮ সালের আগস্ট মাসে এক আলোচনায় বসেন।^{১২} নেতৃবৃন্দ জেলা পরিষদ গঠনের পক্ষে মতামত প্রদান করেন কিন্তু ছাত্র সমাজ এর প্রতিবাদ জানায়। ছাত্রবৃন্দ তিনটি জেলা পরিষদের পরিবর্তে একটি Regional Council করার পরামর্শ দেয় এবং তার সাথে পুনর্বাসিত বাঙালিদের ফেরত নেবার জন্য দাবি করে। আলাপ-আলোচনায় বিষয়টি নির্ধারণের জন্য ১৫ জন নেতা একটি প্রচারপত্র স্বাক্ষরে শান্তিবাহিনীর প্রতি আবেদন জানান। আলোচনার সময় ৯ দফা দাবি পেশ করেন। দাবিগুলোর মধ্যে ২নং ছিল- তিনটি জেলায় নির্বাচনের মাধ্যমে সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন জেলা পরিষদ গঠন। পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন একজন উপজাতি। পরিষদ গঠনের পর কোন কোন বিষয় পরিষদের হাতে থাকবে তা নির্ধারণ করা হবে। আপাতত আলোচনায় স্থির করা হয় যে, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, অসংরক্ষিত পার্বত্য বনাঞ্চল, মৎস্য ও গবাদি পশু, কৃষি, সমবায় সমিতি, উপজাতীয় আইন সংশোধন ও খেলাধুলা, প্রাথমিক শিক্ষা, গ্রাম্য বাজার, স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের লাইসেন্স বিতরণ ইত্যাদি পরিষদের হাতে অর্পিত হবে।^{১৩} ১৯৮৯ সালে ৬ মার্চ স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন পাস হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি ও উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সমঝোতা অনুযায়ী ১৯৮৯ সালের ২৫ জুন তিনটি পরিষদের নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও তার সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনী কিন্তু নির্বাচন সমর্থন করেনি বরং বর্জন করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানায়। তারা উদ্যোগ নেয় নির্বাচন বানচাল করার জন্য, তাই সরকার শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

১৯৮৯ সালের ২৫ জুন স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচনের দিন ধার্য হয়। মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৫০ হাজার। দু'জন চেয়ারম্যান ও ১২ জন সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। জনাব সমীরণ কুমার দেওয়ান এবং গৌতম দেওয়ান যথাক্রমে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। বান্দরবানে কে.এস. চৌধুরী এবং তার তরুণ ভাগ্নে সচিন ক্রু জিরির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। সদস্যদের ১০ জনের মধ্যে রাঙ্গামাটি থেকে ৫ জন, বান্দরবান ৪ এবং খাগড়াছড়ি থেকে ১ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ভোটিংয়ের জন্য মোট ৩৫৮টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। সকাল ৮টা থেকে বিরতিহীনভাবে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ভোটিংহণ চলে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায় যে, বান্দরবানে ৮১ জন, খাগড়াছড়িতে ৫৬ জন এবং রাঙ্গামাটিতে ৪৯ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। শত বাধা উপেক্ষায় সাধারণ জনতা বিপুলভাবে ভোট দেয়।^{১৪} ৭ লক্ষ ১০ হাজার জনগণের মধ্যে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার ভোটার। রাষ্ট্রপতি এরশাদ শান্তিপূর্ণ ভোট প্রদানের জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা জনাব বি.কে. দেওয়ান তার সাথে ছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত

জাতীয় কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি সীমান্তের ওপার থেকে শরণার্থীদের ফিরে আসার আহ্বান জানান।^{১৫} বিরাজমান পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধান হবে বলে সাধারণ মানুষ বিশ্বাসী এবং এরূপ পদক্ষেপ নেবার জন্য তিনি রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জানান।^{১৬}

পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকারের ইতিহাস

পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকারের ইতিহাস একটু ভিন্ন প্রকৃতির। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে ছিল তখন সমগ্র অঞ্চল ৩৭৩টি মৌজায় বিভক্ত থাকে। প্রত্যেক মৌজায় একজন হেডম্যান ছিলেন। তাদের প্রধান কাজ ছিল গোত্র প্রধানদের প্রতিনিধি হিসেবে খাজনা আদায় করা। গ্রামের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও কল্যাণকর কার্যাদি দেখাশোনা করার দায়িত্ব হেডম্যানের উপর অর্পিত ছিল। মৌজাগুলো পুনরায় গ্রামে বিভক্ত ছিল এবং একজন কারবারি রাজস্ব আদায় ও জনকল্যাণকর কাজ করতেন। এসব ছিল প্রায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যাপার। ১৯০০ সালে জেলা উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠিত হয়। এটা গঠিত হয় রাঙ্গামাটি, বান্দরবান এবং রামগড় অঞ্চলের গোত্র প্রধানদের সমন্বয়ে। গোত্র প্রধানরা ছিলেন চাকমা, বোহেংমং এবং মং গোত্রের প্রতিনিধি। জেলাপ্রশাসককে রাজস্ব আদায়ে সহযোগিতার জন্য কাউন্সিল গঠন করা হয়। অবশ্য তাদের হাতে সাধারণ শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্য, জনকল্যাণকর কাজ ইত্যাদি অর্পণ করা হয়। ১৯৬০ সালে সর্বপ্রথম জেলা পর্যায়ে জেলা কাউন্সিল গঠন করা হয়। ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় এই নির্বাচন হয়। জেলা কাউন্সিলের ২২ জন সদস্য ছিলেন। সদস্যগণ সকলেই মনোনীত হতেন। মোট ২২ জনের মধ্যে ১০ জন সরকারি কর্মকর্তা এবং ১২ জন নন অফিসিয়াল। জেলাপ্রশাসক ছিলেন এর চেয়ারম্যান। বেসরকারি সদস্যগণ জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নির্ধারিত হতেন। মহকুমা প্রশাসকগণ, জেলা শিক্ষা অফিসার, কৃষি অফিসার, প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান স্বাস্থ্য অধিকর্তা, পুলিশ সুপার, জনসংযোগ অফিসার ইত্যাদি ছিলেন সরকারি সদস্য। থানা কাউন্সিলের সংখ্যা ১১টি এবং সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৭ জন। সকলেই নিযুক্ত হতেন। ৩৭ জনের মধ্যে ২০ জন সরকারি এবং ১৭ জন বেসরকারি সদস্য। ইউনিয়ন কাউন্সিলের সংখ্যা ছিল ৩৯টি এবং সদস্যদের ২৭০ জন নির্বাচিত এবং ১৩৫ জন মনোনীত। দেশের অন্য ইউনিয়ন কাউন্সিলের অনুরূপ এসব বিরোধসমূহের বিচার করতেন। ইউনিয়নের গড় আয়তন ছিল ১৩.০৬ বর্গমাইল এবং গড় কাউন্সিলের বিচারের ক্ষমতা ছিল না। এর প্রধান কারণ হল হেডম্যান গোত্রের মধ্যকার জনসংখ্যা ১৭০০ জন। জেলায় ১৯৬৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত কোনো পৌর কমিটি বা মিউনিসিপ্যাল কমিটি ছিল না। বাজার ফান্ড নামে একটি কমিটি ছিল। একে পৌরসভার বিকল্প বলা যায়।

বাজারের উন্নয়নে উক্ত কমিটি গঠিত হত। জেলাপ্রশাসক পদাধিকার বলে বাজার ফান্ডের প্রশাসক ছিলেন। তিনি বিভাগীয় কমিশনারের পরিচালনাধীনে কাজ করতেন। মহকুমা প্রশাসকগণ মহকুমার আওতায় বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতেন। শহর কমিটি বা টাউন কমিটি রাঙ্গামাটিতে গঠন করা হয় ১৯৬৫ সালে। প্রাথমিক অবস্থায় ৬ জন সদস্য

ছিলেন। চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ নির্বাচিত হতেন।^{১৭} বর্তমানে তিনটি জেলা শহরে তিনটি পৌরসভা আছে। বান্দরবান জেলায় ৭টি থানা ও ১৩টি ইউনিয়ন পরিষদ, খাগড়াছড়িতে ৮টি থানা ও ১৭টি ইউনিয়ন পরিষদ এবং রাঙ্গামাটিতে ১০টি থানা ও ২৬টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে।^{১৮} তিনটি জেলায় আছে তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদ। পূর্বেই উল্লেখ করা আছে যে, ইউনিয়ন পরিষদে ৩ জন মহিলা সদস্য ভিন্ন অন্য কোনো প্রকার মনোনীত সদস্য নেই। কিন্তু ১৯৮৩ সালে সরকার ঘোষণা দেয় যে, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় অনূর্ধ্ব ৩ জনকে মনোনয়ন দিতে পারবে। ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন গোত্রের লোকদের প্রতিনিধিত্বপ্রদানের জন্য এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।^{১৯} ইউনিয়ন পরিষদের অনুরূপ অন্য কোনো মনোনীত সদস্য না থাকলেও বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণকে উপজেলা পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য মনোনয়নের ব্যবস্থা রাখা হয়। তবে মনোনীত সদস্য প্রতিনিধি সদস্যের বেশি হবেন না।^{২০} মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় যে জেলা কাউন্সিল গঠিত হয় সেখানে দেশের অন্যসব কাউন্সিলের মতো সদস্যগণ ইউনিয়ন কাউন্সিল ও টাউন কমিটির চেয়ারম্যানদের ভোটে নির্বাচিত না হয়ে সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন।^{২১} দেশ স্বাধীন হবার পর সেখানে বিধান মোতাবেক জেলা পর্যায়ে কোনো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের স্তর সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি।

শান্তিচুক্তি

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে বহু জাতিগোষ্ঠীর আবাসস্থল। দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি-সংক্রান্ত বিরোধের ফলে একটি জটিল সংঘাত সৃষ্টি হয়। এই সংঘাত অবসানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (জেএসএস)-এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটি বাংলাদেশের আধুনিক ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শান্তি উদ্যোগ। স্বাধীনতার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠী তাদের স্বতন্ত্র পরিচয়, ভূমি অধিকার এবং রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলে। কেন্দ্রীয় নীতিমালার সঙ্গে জাতিগত গোষ্ঠীগুলির সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বাস্তবতা মিল না হওয়ায় উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। ১৯৮০-৯০ দশকে সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করলে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কয়েক দফা আলোচনার পর ১৯৯৭ সালে চূড়ান্ত সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব হয়।

শান্তিচুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়। এই পরিষদ শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভূমি ব্যবস্থাপনা, বননীতি, উন্নয়ন পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে তদারকি ও নীতিনির্ধারণের ক্ষমতা পায়। রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা পরিষদ পুনর্গঠিত হয় এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ও প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এছাড়া ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ‘পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন’ গঠন করা হয়। ভূমি মালিকানা, দখল ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলোর সমাধানই ছিলো এর মূল লক্ষ্য। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে সেনা ক্যাম্প কমিয়ে আনা হয় এবং জেএসএস-এর সশস্ত্র সদস্যদের সরকারি অনুশাসনে ফিরে আসার সুযোগ দেওয়া হয়।

তাছাড়া ভারতে পালিয়ে যাওয়া পাহাড়ি শরণার্থীদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছিল চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মূলত পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য পারস্পরিক আস্থা পুনর্গঠন ছিলো এ চুক্তির মূল লক্ষ্য।

চুক্তি সম্পাদনের পর বিএনপির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়। চুক্তির কোন কোন ধারা সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তা তুলে ধরা হয়। মোট ১৮টি ধারা অসামঞ্জস্য উল্লেখ করা হয়। প্রতিবাদের উত্তরে সরকার থেকে অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। এতে সরকার সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা দেয় যে, পার্বত্য শান্তিচুক্তি সংবিধানের আওতার মধ্যে থেকেই হয়েছে।

খসড়া বিল

পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন আইন ও পুরাতন আইনের সংশোধনী মিলিয়ে ৪টি খসড়া বিল তৈরির কাজ আরম্ভ হয়। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় জরুরি ভিত্তিতে এসব খসড়া বিল তৈরি করে। খসড়া বিলগুলো মন্ত্রিসভার বৈঠকে পেশ করা হবে। মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর বিলগুলো জাতীয় সংসদের অধিবেশনে উপস্থাপন করা হবে। চুক্তির আলোকে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ’ শিরোনামে নতুন আইনের খসড়া বিল প্রস্তুত করা হয়। তাছাড়া তিনটি জেলার ১৯৮৯ সালের আইন সংশোধন করে তিনটি পৃথক সংশোধনী বিল তৈরি করা হয়। বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে ১৬ ডিসেম্বর ছুটির দিনেও কাজ করা হয়। সরকারিভাবে জানানো হয় যে, চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য এই ৪টি আইন ভিন্ন আর কোনো আইন রচনার দরকার হবে না। শান্তিচুক্তি ধারার মধ্যে আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ গঠন, কার্যক্রম, আয়ের উৎস নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয় যেভাবে ছিল তা প্রায়ই অনুরূপ রাখা হয়। খসড়া সংশোধনী বিলে আনীত অন্যান্য মূল সংশোধনী গুলো হচ্ছে, পরিষদের সদস্য সংখ্যা আগের মত ঠিকই থাকবে তবে মহিলাদের জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং ৩ জনের মধ্যে ১ জন হবেন অ-উপজাতীয়। ডেপুটি কমিশনারের (ডি.সি.) নাম পরিবর্তন হয়ে হবে সার্কেল চিফ (সিসি) এবং মেয়াদকাল হবে ৩-এর স্থলে ৫ বছর। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠনের সিদ্ধান্তও চূড়ান্ত করা হয় যে, বিভাগের সচিব পদে একজন উপজাতীয়কে নিয়োগ দেয়া হবে।

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির বিপক্ষে বিরোধী দল সুদৃঢ় অবস্থান নেয়। বিরোধী দল চুক্তিটিকে সংবিধানবিরোধী বলে অভিহিত করে। অনেক বুদ্ধিজীবী শান্তিচুক্তি সুপ্রিম কোর্টে পাঠানোর পরামর্শ দিয়েছেন। বেগম খালেদা জিয়া চুক্তি সম্পর্কে জনগণের ম্যান্ডেট নেবার জন্য সরকারকে পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলকে সংসদে ফিরে এসে আলোচনায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। প্রধান বিরোধী দল পার্বত্য শান্তিচুক্তি বিষয়ে সকল রাজনৈতিক দল ও পেশাজীবী সংগঠনকে নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক করার অনুরোধ জানায়। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ চুক্তিকে সর্বোচ্চ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু চিহ্নিত করে রাষ্ট্রপতিকে কোনো প্রকার বিতর্কে না টেনে এ নিয়ে সরকার ও বিরোধী দল সংসদের ভেতরে ও বাইরে আলোচনা করতে পারে বলে মত ব্যক্ত করেন।^{২২} চুক্তির শর্তানুসারে শান্তিবাহিনী অস্ত্রসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়। জনসংহতি

সমিতির ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে (সম্ভ লারমা) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান হওয়ার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এর সাথে আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর জনসংহতি সমিতি রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। সমিতির কর্মীরা উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল নামে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে সমিতির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করে। উত্তরাঞ্চলের কর্মসূচি পালন করা হয় সীমান্তবর্তী চিষুক এলাকায় এবং দক্ষিণাঞ্চলে পালিত হয় মিজোরাম সীমান্তের বমপাড়া এলাকায়। সমিতির সদস্যরা বিভিন্ন কোম্পানি অনুযায়ী অস্ত্রসমর্পণ করবে। ১৯৯৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি অস্ত্রসমর্পণের দিন নির্ধারিত হয়। ঐ দিনে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যদের প্রথম দলটি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে অস্ত্রসমর্পণ করবে। প্রথম দলটির নেতৃত্ব দিবেন জনসংহতির প্রধান ও শান্তিবাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। প্রথম দিনে ৬০০ সদস্য আত্মসমর্পণ করবেন। এরপর ১৬ ফেব্রুয়ারী বাঘাইছড়ি হাই স্কুল মাঠ, ২২ ফেব্রুয়ারী বরদাস হাই স্কুল মাঠ এবং ২৮ ফেব্রুয়ারী দুদুখছড়িতে সর্বশেষ দল আত্মসমর্পণ করবে। প্রথমে ১৬০০ সদস্যদের তালিকা দেয়া হয়। পরে আরও দেয়া হবে বলে জানানো হয়। খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপ্রধানের উপস্থিতিতে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা। আত্মসমর্পণকারীদের সরকার সাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করে। প্রধানমন্ত্রী সম্ভ লারমাকে প্রথমে গোলাপ দিয়ে বরণ করেন। অস্ত্রসমর্পণের দিন বিএনপি হরতালের ডাক দেয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন ফেডারেশন চুক্তিবিরোধী স্লোগান দেয়। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানায়। পাহাড়ি গণপরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রসিত খীসা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি দীপ্তি শংকর চাকমা ও হিল উইমেন ফেডারেশনের সভানেত্রী কবিতা চাকমা এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে লারমা-চক্র চূড়ান্তভাবে জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নেতৃত্বদ আরও বলেন, অস্ত্রসমর্পণ হলেই শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় না। ১৯৮৫ সালেও প্রীতি গ্রুপ মহাসমারোহে রাঙ্গামাটি স্টেডিয়ামে আত্মসমর্পণ করেছিল কিন্তু তাতে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি স্থাপিত হয়নি।^{২০} অস্ত্রসমর্পণের দিন প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার সময় তারা গ্যালারি থেকে শান্তিচুক্তি মানি না, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে'-বলে স্লোগান দেয়। জাতীয় পার্টির প্রধান এইচ এম এরশাদ ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করেন। এদিকে সরকার চুক্তির ধারা মোতাবেক অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের আশাবাদ ব্যক্ত করে।

সংসদে বিল উত্থাপন

শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংসদে বিল উত্থাপিত হয়। বিএনপির সাংসদ কর্নেল (অব.) আকবর হোসেন বলেন, এ চুক্তিতে শান্তি আনার নামে বাঙালিদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। বাঙালিদের চেয়ারম্যান পদের জন্য উপযুক্ত মনে করা হয়নি। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে ৫ লক্ষ বাঙালি সশস্ত্র আন্দোলন করতে পারে। ১২-৪-৯৮ তারিখে সংসদে বিল উত্থাপিত হয়। প্রায় তিন ঘণ্টা তীব্র বাকবিতণ্ডার পর বিএনপি ওয়াকআউট করে এবং জাতীয় পার্টি প্রবল আপত্তি জানায়। এর মধ্যেও জাতীয় সংসদের পার্বত্য চট্টগ্রাম

আঞ্চলিক পরিষদ বিল ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সংশোধনী বিল মিলিয়ে পার্বত্য বিষয়ক চারটি বিল উত্থাপিত হয়। বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া বিল উত্থাপন স্বাগত রেখে সাধারণ আলোচনার দাবি করেন। জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি বাতিল করে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমস্যার সমাধানের আহ্বান জানান। এরশাদ বিএনপির এ দাবিকে সমর্থন করেন। চুক্তির মাধ্যমে দেশের এক-দশমাংশ ছেড়ে দিয়ে দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে বাংলা ভাষাভাষীদের নানাভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। চুক্তি গোপনে করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। এ প্রসঙ্গে তোফায়েল আহমেদ বলেন, চুক্তি গোপন হয়নি। এখানে বিএনপির দুই সাংসদ জনাব সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম ও আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং জাতীয় পার্টির সাংসদ অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বিএনপির সদস্যগণ মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন না। উপস্থিত থাকলে তারা সব জানতে পারতেন। তাছাড়া এ চুক্তি হয়েছে এরশাদ সরকারের সময়। বিএনপি পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকেও তার কোনো প্রকার পরিবর্তন করেনি। তারা সমস্যার সমাধানের জন্য মিটিং করেছেন ১৩ বার এবং সব হয়েছে ভারতে বসে। আর আওয়ামী লীগ আলোচনা করেছে রাজধানীতে।^{২৪} তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯-এর ৩২ ধারার সংশোধন ও প্রতিস্থাপন এবং ৩টি ধারা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা হয়েছে। এই সংশোধিত আইন ‘পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন’ নামে পরিচিত হবে। পরিষদে ১২ জন উপজাতীয় এবং ৬ জন অ-উপজাতীয় ছাড়াও ৩ জন মহিলা সদস্য থাকবেন। তিনজন মহিলা সদস্যের মধ্যে ২ জন উপজাতীয় এবং ১ জন অ-উপজাতীয় হবেন। তারা সরাসরি নির্বাচিত হবেন। আইনে কোনো ব্যক্তি উপজাতীয় কিংবা অ-উপজাতীয় কি না তা সার্কেল চিফ (রাজা) ঠিক করবেন। আগের আইনে সে ক্ষমতা ডেপুটি কমিশনারের উপর অর্পিত ছিল। এখন থেকে সার্কেল চিফ এরকম সার্টিফিকেট দিবেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ সংক্রান্ত ৪টি বিল নিয়ে আলোচনার জন্য ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। বিএনপি প্রথম ৩৪টি বৈঠকে অনুপস্থিত থাকার পর ৩৫তম বৈঠকে উপস্থিত হয়। ঐ কমিটিতে বিএনপির ৪ জন সদস্য ছিলেন। ১২-৪-৯৮ তারিখে সংসদে বিল উত্থাপিত হলে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এবং বিরোধী দলের নেত্রী বিপক্ষে জোরালো বক্তব্য প্রদান করেন। চারটি বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ৭ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেবার জন্য বিশেষ কমিটিতে পাঠানো হয়। বিলগুলো বিশেষ কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাবের উপর আলোচনার সুযোগ দাবি করে বিএনপি ১ মিনিটের জন্য ওয়াকআউট করে। এ সময় বিএনপি দলীয় সাংসদগণ সংসদ কক্ষের মধ্যেই নানা প্রকার উত্তেজনাপূর্ণ স্লোগান দেয়। স্পিকার বলেন, বিলের এ পর্যায়ে আলোচনার কোনো নজির নেই।

এদিকে উত্থাপিত বিলের কয়েকটি ধারা নিয়ে জনসংহতি সমিতি আপত্তি জানায়। এতে শান্তিচুক্তির সাথে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় বলে তারা মনে করেন। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করা হয়। কর্মকর্তাবৃন্দ এতদসংক্রান্ত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সত্বর বৈঠকে বসার দাবি জানান, তা না হলে ঐ বিল মানা হবে না বলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়। উত্থাপিত বিলের অসঙ্গতি সম্পর্কে বলা হয়, আঞ্চলিক পরিষদ বিলে আঞ্চলিক পরিষদের প্রবিধান প্রণয়ন ও বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন

কার্যকর করার ক্ষেত্রে অন্যান্য আইন, বিধি ও অধ্যাদেশ সংশোধনের জন্য আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশ ও পরামর্শ সংক্রান্ত যে অধিকার চুক্তিতে বর্ণিত আছে তা পরিষদ বিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তাছাড়া দাবি করা হয় যে, আঞ্চলিক পরিষদের বিভিন্ন কার্যাবলি ও অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠনসহ অন্য অনেক ধারার সাথে সামঞ্জস্য নেই। এতে নানা প্রকার সংশোধন ও সংযোজন করা হয়েছে। এসব সমস্যার সমাধানের জন্য ১৭-৪-৯৮ তারিখে দু'পক্ষের বৈঠক বসে।^{২৫} তিন দিনের বৈঠকের পর সমস্যার সমাধান হয়। জনসংহতি সমিতি পার্বত্য জেলা পরিষদের ১৪টি এবং আঞ্চলিক পরিষদের ২৯টি সংশোধনী আনয়ন করে। বিশেষ কমিটি বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষায় চূড়ান্ত করে ২৯-৪-৯৮ তারিখে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে রিপোর্ট পেশ করে। মতপার্থক্যের জন্য বিএনপি ওয়াকআউট করে। কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট রহমত আলী কমিটির ২৪তম (আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদ সংক্রান্ত ৩টি বিল এবং ২৫তম আঞ্চলিক পরিষদ সংক্রান্ত বিল) রিপোর্ট পেশ করার সময় বলেন, “৪ টি বিল নিয়ে কমিটির মোট ৩টি বৈঠক হয়েছে ১৫, ১৬ ও ২৭ এপ্রিল। প্রথম বৈঠকে জেলা পরিষদ সংক্রান্ত ৩টি বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়। কিন্তু ঐ দিন বিএনপির ৪ জন এবং জাতীয় পার্টির ১ জন সদস্য অনুপস্থিত থাকেন। তারা আলোচনায় অংশ না নিয়েই নোট অফ ডিসেন্ট দিয়েছেন, যা বিধিসম্মত নয়। আঞ্চলিক পরিষদ বিলের ৩৬ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত আলোচনায়ও তারা অনুপস্থিত থাকেন তবুও রিপোর্টে তাদের দেয়া নোট অফ ডিসেন্ট অন্তর্ভুক্ত করেছি।” বিএনপি ও জাতীয় পার্টির সদস্যগণ কমিটির কার্যপ্রণালী বিধি নিয়ে আলোচনার দাবি জানান। এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, ইহা বিধিবহির্ভূত। তিনি বলেন, “কমিটির রিপোর্ট নিয়ে বিতর্কের কোনো সুযোগ নেই। কমিটি হল মিনি পার্লামেন্ট। পার্লামেন্টে বিল পাস হলে যেমন আলোচনায় নিয়ে যাওয়া যায় না। তেমনি কমিটিতে কোনো বিল অনুমোদন করার পর সেই বিলে আর ফিরে যাওয়া যায় না।” বিতর্ক শেষে স্পিকার তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে বলেন, প্রথম বৈঠকে বিএনপি ও জাতীয় পার্টি সংশ্লিষ্ট সদস্যগণের অনুপস্থিতিতে যে তিনটি বিল চূড়ান্ত করা হয় তাতে নোট অফ ডিসেন্ট দেবার সুযোগ নেই। কাজেই কমিটির ২৪ ও ২৫তম রিপোর্ট সংসদে যথাযথভাবে গৃহীত হল। প্রতিবাদস্বরূপ বিএনপি দলীয় সদস্যবৃন্দ ওয়াকআউট করেন এবং মাত্র ২ মিনিট পর ফিরে আসেন। আঞ্চলিক পরিষদ সম্পর্কে যে নোট অফ ডিসেন্ট দেয়া হয় তাতে বলা হয় যে, এই আইন বাংলাদেশী নাগরিকের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করেছে। বিলটি প্রত্যাহারের অনুরোধ জানানো হয়। বিরোধী দলের একটি সূত্র জানায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের ৪টি বিল পাসে প্রবলভাবে বাধা দেয়া হবে। এক্ষেত্রে বিএনপি ও জাতীয় পার্টির মধ্যে সমঝোতা হয় বলে জানা যায়। বিলের উপর আলোচনার জন্য ৪০০ নোটস জমা পড়ে। এরশাদ এ বিল পাসের প্রক্রিয়াকে চুক্তির নামে বিষ পান করার সমতুল্য বলে অভিহিত করেন। একে তিনি সর্বনাশা চুক্তি বলে অভিহিত করেন। জাতীয় সংসদে ৩ মে রবিবার তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের তিন আইনের সংশোধনী বিলে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার সংশোধনী প্রস্তাব আসে। স্পিকার আলোচনা সংখ্যা ৩৩ জন সীমিত করায় বিএনপি ও জাতীয় পার্টি তুলকালাম কাণ্ড আরম্ভ করে। প্রত্যেককে আলোচনার সুযোগ দেবার জন্য জোর দাবি জানানো হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে স্পিকার বলেন, এ দাবি মানা হলে প্রতি দিন আট ঘণ্টা করে বিলের উপর আলোচনা করলে শেষ হবে ৩ বছর ৮ মাসে। এটা

কোনোক্রমে সম্ভবপর নয়। আলোচনা শেষে রাঙ্গামাটি জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ সংশোধনী বিল পাস হয়। এতে সামান্য কয়েকটি ধারার পরিবর্তন আনা হয়। এ সময় বিএনপি সংসদে অনুপস্থিত থাকে। বেগম খালেদা জিয়ার কথায়, বিরোধী দলকে আলোচনার সুযোগ না দিয়ে তাড়াহুড়ো করে আইন পাস করা হচ্ছে দেশ বিক্রির জন্য। বিএনপির দলীয় সংসদ সদস্যগণ ৪-৫-৯৮ তারিখ বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বঙ্গভবনে গমন করেন। বিএনপি নেতারা রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ জানিয়েছেন, জাতীয় সংসদে ৪টি বিল পাস হয়ে যাবার পর রাষ্ট্রপতির কাছে স্বাক্ষরের জন্য যখন আসবে তখন যেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি সেগুলো ১৫ দিন আটকে রাখেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, সবই হবে সাংবিধানিকভাবে। রাষ্ট্রপতি তাদের বলেন, বিলগুলো যদি সংবিধানবিরোধী হয়, তবে বিল পাঠানোর পর বিষয়টি কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা যায়। এমনিভাবে ৪-৫-৯৮ তারিখে খাগড়াছড়ি স্থানীয় পরিষদ বিল এবং ৫-৫-৯৮ তারিখ মঙ্গলবার বান্দরবান স্থানীয় সরকার বিল ১৯৯৮ পাস হয়।

যতই আমরা চুক্তির কথা বলি কিন্তু পার্বত্যবাসীরা এই চুক্তিতে খুশি না। তারা মনে করে যে, এই চুক্তিতে তাদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। পরবর্তীতে আমরা পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারি। নিম্নে এসম্পর্কে কিস্তি আলোকপাত করা হলো:

নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা তিন পার্বত্য জেলার বর্তমান আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন, “এখানে প্রতি মাসেই কোথাও না কোথাও খুন ও প্রতিখুনের ঘটনা ঘটছে। খুনাখুনির ঘটনাগুলো ঘটছে মূলত প্রত্যন্ত এলাকায় এবং তা বেআইনী অস্ত্রধারী পাঁচটি উপদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। এলাকায় আধিপত্য বিস্তার ও চাঁদাবাজি সংঘাতের প্রধান কারণ।”^{২৬} পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পর্কে এক পক্ষ বলছে চুক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে, আরেকপক্ষের দাবি, মূল সমস্যা রয়েই গেছে। মূলত চুক্তির অনেক ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে শুধু কাগজে-কলমে বাস্তবে সেটা দেখা যায় না। চুক্তি ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়/কার্য যেমন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, সমবায়, স্থানীয় পর্যটন, কৃষি, যুব উন্নয়ন, ক্রিড়া ও সংস্কৃতি, যোগাযোগ ইত্যাদি জেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হলেও পূর্ণ কর্তৃত্ব দেওয়া হয়নি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো তাদের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব ধরে রেখেছে।^{২৭}

পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল সমস্যা ভূমির মালিকানা নিয়ে বিরোধ। মূলত রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। জিয়া ও এরশাদের সামরিক শাসনামলে সমতলের কয়েক লাখ দরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষকে তিন পার্বত্য জেলায় পুনর্বাসিত করার কারণে পাহাড়ীরা অনেকটা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে।^{২৮} শান্তিচুক্তি মোতাবেক ১৯৯৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন গঠিত হলেও এ কমিশনের বিধিমালা আজ অবধি প্রণীত না হওয়ায় এটি এখনো পুরোদমে কার্যক্রম শুরু করতে পারেনি। চুক্তির পরে শুধু আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্বই বাড়েনি, এ দ্বন্দ্বকে পুঁজি করে বিশেষ স্বার্থস্বার্থী মহল পাহাড়ের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পারিক আস্থা ও বিশ্বাসের জায়গাগুলোতে

ফাটল ধরিয়ে দিচ্ছে। দমন-নিপিড়নসহ নানা কারণে পাহাড়ী জনগণ বর্তমানে হতাশ ও বিক্ষুব্ধ। তারা সাধারণ মানুষের মতো মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে বাঁচতে চায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক গঠিত পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন করতে হবে। এ লক্ষ্যে স্থায়ী বসিন্দাদের নিয়ে ভোটের তালিকা প্রণয়ন করে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে এর বিধিমালা দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে। এছাড়া পাহাড়ের জনগনের মধ্যে যে আস্থার সংকট তৈরি করা হয়েছে, সেটি দূর করার জন্য সরকার কর্তৃক দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

উপসংহার

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, জনগণের অংশগ্রহণ এবং তৃণমূল পর্যায়ে সেবা নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, জাতিগত বৈচিত্র্য, ঐতিহাসিক পটভূমি এবং বিশেষ আইনগত কাঠামোর কারণে এখানকার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। পার্বত্য জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ এবং ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন, সার্কেল চিফ, হেডম্যান ও কারবারি-একত্রে এই অঞ্চলের শাসনব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে। ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হলেও এর পূর্ণ বাস্তবায়ন এখনও চ্যালেঞ্জের মুখে। ভূমি সমস্যা, প্রশাসনিক দ্বৈততা, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ, এবং সীমিত আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যকারিতাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। তা সত্ত্বেও, সঠিক নীতিমালা প্রণয়ন, শান্তি চুক্তির কার্যকর বাস্তবায়ন, এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। এ প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের বহুত্ববাদী সমাজে স্থানীয় শাসনব্যবস্থা উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

তথ্যসূত্র

- ^১ G. D. H. Cole; Local & Regional Government (Melbourne; Cassell & Co. Ltd., 1947), P.28.
- ^২ H. F. Alderfer; Local Government in Developing Countries (New York: Mac Graw Hill Book Company, 1964), P.178.
- ^৩ Sir Ivor Maud, et. al; Local Government in England and Wales (Toronto: Oxford University Press, 1964), P.5

- ৪ Samuel Humes, et.al; The Structure of Local Government Throughout the World, (The Hague: Martinus Nij hat, 1961), P.8.
- ৫ H. Finer; English Local Government (London; Methuen and Co. Ltd., 1946), Chapter 1, P.2.
- ৬ এমাজউদ্দিন আহমদ; “জুম ল্যাণ্ডের পরিণতি”-মাসুদ মজুমদার (সম্পাদিত), আহা পর্বত; আহা চট্টগ্রাম (ঢাকা: চৌকস প্রিন্টার্স লি., ১৯৯৭), পৃ.২০।
- ৭ আলিমুজ্জামান হারুন; সাংবাদিকদের চোখে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিবাহিনী (ঢাকা: জাহান প্রিন্টিং, ১৯৯২), পৃ.১৩।
- ৮ সিদ্ধার্থ চাকমা; প্রসঙ্গ: পার্বত্য চট্টগ্রাম (কলিকাতা: নাথ ব্রাদার্স, অগ্রহায়ণ, ১৩৯২), পৃ. ৪৯।
- ৯ বাংলার বাণী, ১৩ আগস্ট, ১৯৭৫।
- ১০ মো: নুরুল আমীন ও অন্যান্য; “পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যার একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ” (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা: ৪২, ১৯৯২), পৃ. ১৪১।
- ১১ ডব্লু চাকমা; পার্বত্য চট্টগ্রাম : স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের সন্ধানে (রাস্তামাটি: পার্বত্য চট্টগ্রাম অধ্যয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৭), পৃ. ৯১-৯৫।
- ১২ Hill Students Council of Greater Chittagong Hill Tracts District (Boi-S a-Bi, 1990), P. 9.
- ১৩ বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫, পৃ. ২১।
- ১৪ New Nation, 24.6.89.
- ১৫ সংবাদ, ২৩/০৬/৮৯।
- ১৬ সংবাদ, ২৬/০৬/৮৯।
- ১৭ Bangladesh District Gazetteers- Chittagong Hill Tracts District, P. 279-280.
- ১৮ Bangladesh Bureau of Statistics, 1986.
- ১৯ The Local Government (Union Parishad) (Amendment Ordinance), 1983 (Ord. No. LXXI of 1983), Sec. 2.
- ২০ The Local Government (Upazila Parishad and Upazila Administration Re-organisation), (4th Amendment Ordinance), 1983, (Ord. No. LXXI of 1983), Art. 2.
- ২১ A Handbook of Basic Democraciesw, op. cit, Art. 15(i)
- ২২ Shelly Fieldman; “Rural Infrastructural Development in Bangladesh and Its Potential Consequences for Re-productive Behaviours” Journal of the Social Studies (Dacca: Center for Social Studies 1980), Vol. 7.P. 28.
- ২৩ Ahmadullah Miah; “Problems if Rural Development: Some Household Level Indicators”. (Dacca: Statistics Research and Evaluation Division, IRDP, 1976), P.3.
- ২৪ Azher Ali; Rural Development in Bangladesh (Comilla: BARD. 1975), P. 60.
- ২৫ Shelly Fieldman; “Rural Infrastructural Development in Bangladesh and Its Potential Consequences for Re-productive Behaviours” Journal of the Social Studies (Dacca: Center for Social Studies 1980), Vol. 7, P. 20.
- ২৬ প্রথম আলো, ২০/০৩/২২
- ২৭ প্রথম আলো, ২০/০৩/২২
- ২৮ প্রথম আলো, ২০/০৩/২২